OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 23 - 28
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 23 - 28
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের কয়েকটি প্রবণতা : প্রেক্ষিত, কমলকুমার মজুমদারের গল্প

ড. কুহেলী ঘোষ
Email ID : k92ghosh@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Kamalkumar Majumdar, Story, Freedom, Trends, Politics, Food crisis, Urbanization, Naxal movement.

Abstract
Kamalkumar Majumdar (1914-1979) is an exceptional name in Bengali literature. He is best known for his unique writing style. He has been active throughout his life in keeping his writing alive from the confines of political, business and advertisement. The literal language used by him is unconventional and the style of writing is out of ordinary. Most of the stories were published in little magazines, which gave him a lot of freedom to write. He started writing stories from the 30s. The early stories written by him are far-fetched in terms of subject matter, even though they are standing in the context of Bengal, which has been uprooted for political reasons. The male-female relationship have their innermost as art-form in all there stories. In the interim, the language of the story was simple and the Bengali syntaxtual deviation was unheeded.

In 1947 came the moment of our Independence. A turning point of Bengali literature had begun. Kamalkumar had shown the calamities in the history of Bengal in a different way in his stories. In his various stroies, the political issues were explained from his own point of view. He did not follow the trend of that era, and used to bring up the contemporary issues much earlier than other, according to his own will. Otherwise, why would he wrote about Swadeshi movement in 'Tahader Katha' in 1958, why he wrote 'Rukminikumar' even after ten years. In 1948, he wrote a story 'Jal' about the natural disaster in Medinipur and the famine in Bengal. The history of Tebhaga movement is rooted in the story of 'Teish'. Some of the trends of post-independence period have been upheld in his various stories. For example, 'Khelar Bichar', 'Bagan Daibabani' explains how European's modernity was to filtrate the Bengali character. 'Bagan Keyari' is a real picture of urbanization. The food crisis and disparity between the rich and poor are reflected in the story of 'Neem Annapurna' and 'Khelar Bichar'.'Mallika Bahar' depicts the position of women in the changing society of the 20th century. 'Khelar Arambha' and 'Kal e Aatatayee' story have shown the image of Bengal bloodied by the Naxalite movement at that time. He found a way to escape from the shelter of spirituality in the decadence of Bengali culture and values. Kamalkumar wanted to settle the violent affected people in the

backwardness. He always yearned for a holy world. He himself stood out as a distinct trend in this urge to prevent the destruction of humanity.

Discussion

বাংলা সাহিত্যে কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯) এক ব্যতিক্রমী নাম। তিনি তাঁর অদ্বিতীয় রচনারীতির জন্যই সর্বাধিক পরিচিতি পেয়ে থাকেন। লেখার জন্যই তিনি লিখে গেছেন। অত্যন্ত সজাগ ও সতর্কভাবে এক একটি গল্পকে রচনা করেছেন। কোনোদিন কোনো ফরমায়েশি লেখা লেখেননি। গল্পে ব্যবহৃত গদ্যভাষা তো অপ্রচলিত বটেই, রচনারীতিটিও ছিল অগতানুগতিক। বাংলা ভাষায় প্রচলিত নর্মসের বিরোধিতা করেই নতুন ভাষা বিনির্মাণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। তিরিশের দশক থেকে তাঁর গল্প লেখার শুরু। প্রথম গল্প 'লালজুতো' বের হয় ১৯৩৭-এ। এছাড়াও 'মধু', 'পিঙ্গলাবৎ' গল্পগুলি লেখা হচ্ছে এ সময়। প্রথমদিকের গল্পগুলি রাজনৈতিক কারণে উত্তোলিত বাংলায় প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও বিষয়গত দিক থেকে অনেকটা দূরবাসী। এসকল গল্পে নর-নারীর প্রেম, মনস্তত্ত্ব ও তাদের অন্তরমহলের কথা শিল্পরূপ পেয়েছে। এই অনায়াস লেখাগুলিতে কন্টেন্টের গম্ভীর ব্যাপার-স্যাপার তখনও আসেনি। অজটিল গল্প আঙ্গিক ও সহজ সরল বাংলা গদ্যে লেখা গল্পগুলিতে বাক্যগত বিপর্যাস তেমন চোখে পড়ে না।

১৯৪৭-এ এল আমাদের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতালাভের মুহূর্ত। বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সংস্কৃতির বুক চিরে দিখণ্ডিত হয়ে রইল। সাহিত্যিকরা সেই ব্যথাকে তুলে ধরলেন তাদের লেখায়— গল্প, কবিতায়। ভারতের স্বাধীনতালাভ ওই শতকটিকে একটা সুউচ্চ স্তম্ভে আলাদা করে রেখেছে। বাংলা সাহিত্যে বাঁক বদলের পর্ব শুরু হয়ে গেল সেখান থেকে। স্বাধীনতার পূর্বেও বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী আন্দোলন বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, কৃষক আন্দোলন প্রভৃতিও নির্দ্বিধায় তুলে ধরেছিলেন সাহিত্যিকরা। কমলকুমারও তাদের থেকে আলাদা ছিলেন না। তবে সাহিত্যে সে অর্থে রাজনৈতিক প্রসঙ্গগুলি পরিহার করে চলতেন। প্রকৃত অর্থে এক অরাজনৈতিক লেখক কমলকুমারের গল্পে কালের দলিল খুঁজলে কখনই পাওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, তিনি বাংলার ইতিহাসে ঘটে যাওয়া বিপর্যয়গুলিকে ভিন্নভাবে দেখিয়েছেন তাঁর গল্পে। গল্পের মাঝে রাজনৈতিক বিষয়-আশয়কে হালকা আঁচড়ে ব্যাখ্যা করে যেতেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁর কাছে কথা তো ইশারা; তাই কিছু সংকেতের ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়ে দিত নেপথ্যে থাকা কথার পাহাড়কে। রাজনৈতিক দলাদলিকে প্রশ্রয় না দিয়ে মানুষের কান্নার উৎস, জীবনক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাসকে নিজ অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় করে রাখতেন। যুগের হুজুগে মেতে উঠতেন না, সমসাময়িক বিষয়গুলি তুলে ধরতেন নিজের মর্জিমতো; নাহলে স্বদেশী আন্দোলনের কথা ১৯৫৮ - তে 'তাহাদের কথা'য় কেন লিখবেন। কেনই বা তারও দশ বছর পর (১৯৬৮ - তে 'রুক্মিনীকুমার' লিখছেন। মেদিনীপুরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বাংলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে ১৯৪৮-এ লিখছেন 'জল' গল্প, তেভাগার করুণ ইতিহাস নিহিত রয়েছে 'তেইশ' (১৯৪৮) গল্পে। স্বাধীনতা পরবর্তী কিছু প্রবণতাকে তুলে ধরেছেন গল্পে। এই প্রবণতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - নগরায়ণ, খাদ্য সংকট সেই সঙ্গে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, সমাজে নারীদের অবস্থান বদল, নকশাল আন্দোলন, মানুষের চরিত্রে দৃঢ়ভাবে জায়গা করে নিচ্ছে ইউরোপীয় আধুনিকতা।

বাংলা ভাষা ও বাঙালির সংস্কৃতির নিয়েই মজে থাকতেন সর্বদা। তাঁর লেখায় বিপ্লব, বিদ্রোহ-এসব শব্দ পাওয়া দুষ্কর। স্ত্রী দয়াময়ী দেবী 'আমাদের কথা' শীর্ষক স্মৃতিচারণায় বলেছেন যে, 'তিনি নিজের লেখার রাজনীতির ধ্বজা ওড়ানোটা একেবারেই পছন্দ করতেন না।'[১] বরং রাজনীতির বিরুদ্ধে গিয়েই কথা বলতেন অনেক সময়। তাঁর বিভিন্ন লেখা প্রবন্ধ চিঠিপত্রে রাজনীতি বিষয়ে বিতৃষ্ণার কথাই পাওয়া যাবে। দেশ-বিদেশের যেকোনো বিপ্লবকেই তিনি 'বজ্জাতি' আখ্যা দিয়ে বসতেন। সে সময়ে সমালোচকরা তাঁকে 'প্রগতি বিরোধী'র তকমা দিয়েছিলেন। কমলকুমার মনে করতেন একমাত্র রাজনৈতিক কারণেই কাজী নজরুল ইসলামকে আমরা এভাবে মনে রেখেছি, অর্থাৎ নিজেদের 'policy'র জন্য মনে রাখতে বাধ্য হয়েছি। সেদিক থেকে এটি রাজনীতির সদর্থক দিক। লিটিল ম্যাগাজিনের লেখক বলে লাভ করেছিলেন মত প্রকাশে স্বাধীনতা। তাছাড়া অপার সাহসে ভর করে যেকোনো বিষয়ে নির্দ্বিধায় কথা বলতে পারতেন। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তিনি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে একটি চিঠিতে বলেছিলেন- "বুক-ফাটা ব্যাপার লইয়া ছেলেখেলা করার জন্যই বঙ্গদেশে আজ

এই দশা"[২]। তিনি মনে করতেন যে দেশনেতারা যেকোনো যুদ্ধ ঘটিয়ে দিয়ে নিজেরা মুনাফা লুটে নেয়। এই খানটায় সতীনাথ ভাদুড়ীর (গণনায়ক) ভাবনার সঙ্গে তার কিছুটা মিল পাবো।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁকে লিখতে বাধ্য করছে 'তাহাদের কথা'র মতো গল্প। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ২০ ও ২৭ ভাদ্র সংখ্যায় 'দেশ' এর পৃষ্ঠায় বের হয় গল্পটি। গল্পের কাহিনিকাল ১৩১৪ সন অর্থাৎ স্বদেশীর কাল। দেশমাতৃকার পূজারী শিবনাথ নিজে তা আন্দোলনে মেতেছিল, সঙ্গে স্ত্রী হেমাঙ্গিনীকেও 'ছাপিয়ে তুলেছিল'। স্বদেশী করার কারণে উচ্চশিক্ষিত শিবনাথের চাকরি যায়। স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হতে দেখে মাথার ঠিক রাখতে পারেনি সে। পিতা-পুত্রের অগাধ টান-ভালোবাসার এই গল্পে দেখানো হয়েছে রাজনীতি কীভাবে মানুষের জীবনকে বিষময় করে তুলছে? এই ইতিহাস গল্পে উঠে এসেছে পুরনো কথা হিসাবে। নিরীহ, সৎ শিবনাথের ভয়ঙ্কর উন্মাদ হবার পরের দিনগুলিই গল্পের কথনকালে দেখানো হয়েছে। পাগল শিবনাথের একমাত্র আশ্রয় পুত্র জ্যোতি, যদিও তাকেও মাঝে মাঝে দিকবিদিকশূন্য হয়ে প্রহারে জর্জরিত করতেও ছাড়ে না সে। ছোট্ট জ্যোতি পরিবার ও সমাজের প্রতিপক্ষে দাঁড়িয়ে পিতার জন্য মরণপণ লড়াই চালিয়ে যায়। ওদিকে মা হেমাঙ্গিনীর শিবনাথকে শিকলে বাঁধবার প্রয়াস চলে। দিদি অন্নপূর্ণাও বুক-ফাটা যন্ত্রণা, লুকিয়ে রেখে ডেপুটির লোভের শিকার হয়ে ওঠার বেতন দিয়ে লোহার শিকল বানিয়ে আনে পিতার জন্য। জ্যোতির ঘুমের ফাঁকে সেই শিকল পরিয়েও দেওয়া হয় শিবনাথের পায়ে। বিন্দি পিসিমাও মূল্যবোধ হারিয়ে যোগ দেয় তাদের দলে।

বিলিতি দ্রব্য বয়কট করা তো চলছে, চারিদিকে স্বদেশীদের মন্ত্রণা ফিসফিসিয়েও উঠছে, কিন্তু পরিবেশ অনেক বদলে গেছে। শিবনাথ জেলে যাবার পূর্বে যে সমাজটা দেখে গেছিল, সে সমাজের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। জেলফেরত স্বদেশীদের কোনো কদর নেই স্বাধীন ভারতেও, আছে পুঁজিপতি ব্যবসায়ীদের রমরমা। গল্পে আত্মারাম মাড়োয়ারীর প্রসঙ্গটির অবতার না হয়েছে সে কারণেই। বিত্তহীন বিপদগ্রস্ত পরিবারটির কাছে দেশের স্বাধীনতা পাওয়া না পাওয়াটা কোনো বৃহৎ ব্যাপার নয়। তারা দিনযাপনে একটু স্বচ্ছলতা আশা করে। কমলকুমারও এ গল্পের দ্বারা বলতে চান দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি শুধু একটি ঘটনামাত্র এর থেকে বেশি কিছু নয়। দেশের মানুষের মুক্তি কোথায়? তারা অভাবে-অনটনে, মস্তিষ্ক বিকারে নিজের পরিবারেই কয়েদী হয়ে বেঁচে থাকছে। মোট কথা রাজনীতির কুফল দর্শানো হয়েছে এ গল্পে।

দেশসেবার নামে ভণ্ডামি ও কদাচারকে দেখতে পাই 'রুক্মিনীকুমার'এ। কামজ প্রবৃত্তির তাড়নায় বিপথগামী স্বদেশী রুক্মিনী রাইফেলের গুলিতে খুন হয় শেষে, শহীদ হয় না। রামানন্দবাবু রাজনৈতিক চরমপন্থার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন রুক্মিনীকে। প্রথমাবস্থায় দেশদ্রোহীদের শাস্তি দিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেও পরমুহূর্তে সে ফিরে এসেছে তার কামনার কাছে। মহৎ সব কাজের মধ্যে থেকেও সে নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারায়। আর কমলকুমারের আঁকা কার্যে কলকাতাও তাকে আরও ঠেলে দেয় সেই পঙ্কিলতার মধ্যে। নীচের তলায় বসবাস করা বাড়ির মালিকের কুষ্ঠরোগগ্রস্থ মেয়ে লবঙ্গলতার বুকে নতুন আশ্রয় খুঁজে নেয় সে। কোনো গুপ্তচর তার নাগাল পাবে না। নিজে বিপ্লবী সংগঠন থেকে দূরে থাকতে চায় সে। যখন জানতে পারে লবঙ্গ তার সন্তানের মা হতে চলেছে, তখন আত্মসমর্পণের জন্য ছুটে যায়। কিন্তু ততদিনে সহযোদ্ধারাই আবিষ্কার করে ফেলেছে রুক্মিনীর আত্মস্বার্থপরতাকে। তাই আত্মসমর্পণ গ্রাহ্য হয় না, মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয় তাকে। এ গল্পে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিচিত ছকের বাইরে রেখে দেখা হয়। স্বদেশপ্রেম ও ব্যক্তিগত বাসনার দ্বন্দ্বে পরাজিত সৈনিক রুক্মিনী।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৮-এ 'জলসাঘর' গল্পে বলেছেন সামন্ততন্ত্রের দিন ফুরানোর কথা। কমলকুমার ১৯৫৮-৫৯-এ 'কয়েদখানা' গল্পে দেখালেন জমিদারি প্রথার আর এক রূপ। ভূস্বামীদের গৌরব তখন অস্তাচলে। কৃষক প্রজারা অনেক আকালের দিন দেখেছে, কিন্তু দিন বদলের পণে বদ্ধ সাধারণ মানুষ জমিদারের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে চায় এবার। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বিজয় পতাকা ওড়াবে খেটে খাওয়া মাটিলগ্ন মানুষেরা। বাইজী পরিবৃত্ত সুরাসক্ত জমিদার মোহনগোপালকে নিয়ে গিয়ে কুপিয়ে মারে তারই সৃষ্টি কয়েদখানার মধ্যে। জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের সংঘবদ্ধ সংগ্রামকে 'কয়েদখানা'র প্রতীকে ধরা হয়েছে এখানে। অনেকে এর পশ্চাতে মার্কসীয় শ্রেণিতত্ত্ব কে আবিষ্কার করেন। 'বাবু' গল্পটিতেও দেখা যাবে ক্ষয়িত আজ আশ্রিতের জীবন যাপন করছেন। ভৃত্য রাখোর সঙ্গে সমলৈঙ্গিক প্রেমকে প্রতিষ্ঠা করা হলেও এখানে এক অভিজাত সামন্তরাজের দিনাবসানের করুণ ছবিকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিশ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 23 - 28
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শতকের গ্রামীণ রাজনীতির এই বিষয়গুলি তিনি খুব সচেতনভাবেই তুলে ধরেছেন। জমির মালিকানায় হস্তান্তর ঘটছে। কোথাও প্রজা সাধারণ তো কোথাও বণিক সম্প্রদায় দখল করে নিচ্ছে বিপুল আয়তনের জমিদারি।

তেতাল্লিশের মন্বন্তর শুধু সেই সময়টুকুর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। পরবর্তী বহু দশক ধরে চলেছিল মানুষের খাদ্যাভাব। 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্প বাংলা প্রদেশের দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে লেখা। এ গল্পের সংস্থান মূলত 'ক্ষুধা'। খিদের জ্বালায় যুথী খেঁদুর মায়ের পোষা পাখির ছোলা চুরি করে খেতে গিয়ে বেধড়ক মার খেয়েছে। প্রীতিলতা আধুনিক কালের অন্নপূর্ণা। অন্নদাত্রী দেবীর মতো যেকোনো মূল্যে সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দিতে তৎপর সে। বাড়ির রকে আশ্রয় নেওয়া বৃদ্ধের বোঁচকার চালগুলি কেড়ে নিতে গিয়ে তাকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দেয়। যেকোনো উপায়ে পেট ভরানোটাই একমাত্র কাঙ্ক্ষিত বিষয়। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে সে জয়লাভ করেছে। শুধু মন্বন্তর নয়, তার মধ্যে দিয়ে এক পুরাণ চরিত্রের নবনির্মাণ ঘটে গেল এখানে। বিত্তবান মানুষের পরিবারের ছবিটি এঁকে মনুষ্যসৃষ্ট খাদ্যাভাবের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক। মানুষের কারণে মানুষের মৃত্যুমিছিল পথে-প্রান্তে, লঙ্গরখানায়।

অন্নাভাবের আর এক রূপ দেখি 'জল' গল্পে। এখানেও খাদ্যের জন্য অন্যায় পথ অবলম্বন করছে চরিত্ররা। চারিদিকের লাট জলমগ্ন, চাষ-আবাদের উপায় নেই দেখে নন্দ ও ফজল ডাকাতির বৃত্তি নিয়েছে। রাতের অন্ধকারে পথিকের জিনিস দ্রব্য লুঠ করে বাড়ি ফেরে তারা। এ গল্প নতুন বাঁক নেয় ফজলের মায়ের মৃত্যু ও নন্দ খুড়োর সঙ্গে বোনের তার বিয়ের প্রস্তাবে। খাদ্য সংকটের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা বয়ে আনে 'জল' গল্পটি।

'তেইশ' (১৯৪৮) গল্পটি তেভাগা আন্দোলনের স্মৃতিবাহিত। এখানে জমি ও কৃষকের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের রেখাটি পরিস্ফুট। তিন নম্বর লাটের সম্পত্তি নিলাম হওয়ায় দিনে দুপুরে এক চাষী জন-মজুরে পরিণত হয়। জমিদারের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহও ঘনিয়ে ওঠে, পরমুহূর্তে নিভিয়ে যায়। তেভাগার চাষিদের মতো তারা ক্ষেপে উঠে দৃঢ় কণ্ঠে বলতে পারে না 'জান দিব তবু ধান দিব না'। বাবুদের প্রচণ্ড ক্ষমতার কাছে আলমের একক বিদ্রোহ ধূলোকণার মতো উড়ে যায়। তার চোখের দৃষ্টি তার যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তুলত, তাই দুটি চোখের বিনিময়ে সে নিজের ও বউটার অন্ন সংস্থানকে বেছে নিল। দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে সে এবার পেট ভরাবে।

১৯৫১তে প্রকাশিত 'মল্লিকা বাহার'এ নারী সমকামের পাশাপাশি সে সময়কার সমাজে নারীদের অবস্থানেরও পরিচয় দেওয়া হয়। বাল্যবিবাহের দ্বারা নারী পরাধীনতা মেনে নেয় না, সে স্বাধীনচেতা। মল্লিকা জীবনে সঠিক পুরুষের অপেক্ষায় যৌবন অতিক্রম করে ফেলেছে। অভাবের সংসারে মা-বাবার অর্থসহায়ক হতে সে চাকুরিকে বেছে নিয়েছে। অপর একটি নারী শোভনাও অনেকটা এই পথেরই পথিক। সমাজে নারী পরিসর ও সমকামিতার 'অতি সাম্প্রতিক' ধারণাকে এখানে কমলকুমার উন্মুক্ত করে দিলেন।

শেষের দিকে লেখা গল্পগুলিতে তিনি নগরায়ণের বিস্তারকে তুলে ধরেছেন। স্বাধীনতা উত্তরকালে অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় পুঁজিপতিদের আগ্রাসন বৃদ্ধি পেয়েছে। এক বিশাল শিল্প নগরের পত্তনের ইতিকথা হল 'বাগান কেয়ারি' গল্প। জৌলুসপূর্ণ নাগরিক জীবনের নমুনারূপে গ্রাম ও অরণ্য ধ্বংস করে চলছে নগরায়ণের কাজ। বিরাট কর্মযজ্ঞে দরিদ্র শ্রমিকদের বলি ঘটছে অহরহ; কারও কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। গল্পে এক দেহাতি কুলির লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায় নতুন সভ্যতার ভিতের পাশেই। তার নিথর দেহের পাশ দিয়ে চলছে লোহা-লক্করের কাজ। ভারতকে সমৃদ্ধশালী করবার ভার এদেরই উপর ন্যস্ত। লাশটিকে কেউ সৎকার করতে এগিয়ে আসে না। এখানে 'মানুষ মানুষের জন্যে' নয়। বিদেশি সরকার যায়, দেশীয় সরকার গড়ে; কিন্তু এই নীচুতলার মানুষগুলি যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই থেকে যায়। বেওয়ারিশ লাশটাকে পুলিশ নিজের পকেট ভরানোর জন্য ক্রিমিনাল বলে ঘোষণা করে চলে যায়। নগর পত্তনের শুভারম্ভে ক্রাইম কেসটা দ্রুত মিটে যায়। শুধু ও গল্পই নয়, বেশিরভাগ গল্পেই কমলকুমার নগর কলকাতার কুৎসিত দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন।

ইউরোপীয় আধুনিকতা ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে বাঙালির জীবনে। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি অন্তঃসারশূন্য নাগরিক এটিকেটে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিকতা ঋদ্ধ নাগরিক কেতাদুরস্ত জনসমাবেশ তাও একটি মৃত্যুকে কেন্দ্র করে- এই অভাবনীয় বিষয়টি দেখতে পাই 'বাগান দৈববাণী' গল্পে। 'বাগান পরিধি' তে এক রমণীর উচ্চাভিলাস ও অনেক না পাওয়ার ক্ষোভ সঞ্চিত হতে দেখি। 'খেলার বিচার' এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ বাড়ি থেকে খাবারের ছাঁদা বেঁধে আনার জন্য

অপমানিত হচ্ছে তারই ছোটো ছেলেটির কাছে। শত অভাবের মাঝেও আত্মমর্যাদার ঠাট বজায় রাখতে চায় সে। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে ভিক্ষাবৃত্তিকে মহত্তম করে দেখা হয়, সেখানে কিছু খাদ্যদ্রব্যকে অন্যের বাড়ি থেকে আনতেও দ্বিধাবোধ করছে বর্তমান যুগের মানুষ। বাইরের চাকচিক্য ধরে রাখাটা যেন যুগের প্রধান লক্ষণ। 'দ্বাদশ মৃত্তিকা' গল্পে আবার মানুষে মানুষে শ্রেণিগত বিভাজনের দৃশ্য। অর্থ ও ক্ষমতার দম্ভে এক শ্রেণি উন্মত্ত, তাদের শান্ত করার উপায় আছে তাদেরই ধ্বংসের মধ্যে।

নকশাল আন্দোলনের ভয়াবহতা কমলকুমারের অনেক গল্পের বিষয় রচনার মূল কারণ হিসাবে দেখা দেয়। 'খেলার আরম্ভ' গল্পে সত্তরের দশকের বিশেষ রাজনৈতিক অস্থিরতার মাঝে কলকাতা নগরীর ছবিটা এরকম- 'এখানে ভগবান নাই, পতঙ্গ নাই, জলকাদা কিছু নাই, শুধুমাত্র শুষ্কতা'[৩]। ''৭০-এর ৮ই নভেম্বর-এর মারাত্মক অন্ধকার''[৪] - এ শুধু বুলেট আর গোলা বারুদের আসা-যাওয়া। কত শত লাশ পড়ে থাকে পথে, কত তরুণীর দেহ উদ্ধার হয় মাঠে-ঘাটে। 'কালই আততায়ী' গল্পও আমাদের ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়েরই কথা বলে। নামকরণেও সময়টির বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়েছে। কোনো রাজনৈতিক দল বা আদর্শকে লেখক অভিযুক্ত করছেন না, সত্তরের রক্ত ঝরানো কালপর্বটাই অভিঘাতী। বিপ্লবীদের চেয়ে সাধারণ নিষ্পাপ মানুষ ভুগছে বেশি। বিরাট এই হত্যালীলায় বাংলার জনতার দুর্দশা ব্যক্ত হয়েছে।

কমলকুমার সবশেষে ফিরতেন সনাতন হিন্দু ধর্মের কাছে। ব্যর্থ স্বদেশী, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, হানাহানি থেকে তিনি যখন চোখ ফেরাতেন তাঁর ঈশ্বরের দিকে তখন সব কেমন প্রশমিত হয়ে যেত। প্রগাঢ় ভক্তি ও চেতনা দ্বারা দেখবার চেষ্টা করতেন মানুষের দুঃখ, দৈন্যতা ও অসন্তুষ্টিকে। মানুষের চরিত্রে স্নেহ, প্রীতির অভাব, আক্রোশ, হিংসা-সবকিছুর পরেও তিনি মানবতার ধ্বংসে কাঁদেন। ঈশ্বরকে, জগৎজননী মাকে, মাধবকে ডাকতেন সংকট মোচনের জন্য। তাঁর 'ঠাকুর' 'ঠাকুর' - করে কাতর হওয়াটাকে অনেকেই বাড়াবাড়ি বলে ভাবতেন, কটাক্ষও করতেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের এই পরাক্রান্ত পুরুষ হেলায় সবকিছুকে উড়িয়ে দিয়ে নিজের ভাবনায় অবিচল থেকেছেন। হিন্দু স্বস্তিবাচন দিয়ে গল্প লেখার যে মধ্যযুগীয় রীতি-এও তাঁর নিজস্ব প্রবণতা।

কমলকুমার স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের এই প্রবণতাগুলিকে এমনভাবে গল্পে প্রদর্শিত করলেন যে নিজেই একটি পৃথক প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

Reference:

১. মজুমদার, দয়াময়ী, 'আমার স্বামী কমলকুমার মজুমদার', নদীয়া, আদম, ২০১০, পৃ. ৬৭
২. ভট্টাচার্য, উৎপল (সম্পা.), কবিতীর্থ-৯২, বত্রিশ বর্ষ, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২০, পৃ. ৬৪
৩. মজুমদার, কমলকুমার, গল্পসমগ্র, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুলাই, ২০১২, পৃ. ২৬৬
৪. ঐ

Bibliography:

খাতুন আসরফী, 'বাংলা কথাসাহিত্য চল্লিশের সময় ও সমাজ', কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১৪
তরফদার দেবাশিস্, 'কমলকুমার রেখাবলী', কলকাতা, ভাষালিপি, ২০১৭
দাস অমিতাভ, 'আখ্যানতত্ত্ব', কলকাতা, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুকসেলার্স, ২০১০
নন্দ চক্রবর্ত্রী সাবিত্রী, 'আধুনিক বাংলা ছোটগল্প মূল্যবোধের সংকট', কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৯
বন্দ্যোপাধ্যায় রাঘব, 'কমলকুমার, কলকাতা পিছুটানের ইতিহাস', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫
বসু স্বপন, দত্ত হর্ষ (সম্পা.), 'বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি', কলকাতা, পুস্তক বিপণি, আগস্ট ২০১৫
মজুমদার কমলকুমার, 'গল্প সমগ্র', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, জুলাই ২০১২
মজুমদার দয়াময়ী, 'আমার স্বামী কমলকুমার', নদীয়া, আদম, ২০১০

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 04
Website: https://tirj.org.in, Page No. 23 - 28
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মাজী প্রশান্ত, 'কমলকুমার', কলকাতা, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৩

সহায়ক পত্র-পত্রিকা

আহমেদ মুন্সী মহম্মদ সাইফুল (সম্পা.), 'উড়াল কথা', কমলকুমার মজুমদার বিশেষ সংখ্যা, দশম বর্ষ, অষ্টম-নবম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৭

চিনি মানসকুমার (সম্পা.), 'অন্যমন', কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৭

ভট্টাচার্য উৎপল (সম্পা.), কবিতীর্থ-৯২, 'কমলকুমার মজুমদার : জন্মশতবর্ষে আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য', বত্রিশ বর্ষ, কলকাতা, আশ্বিন ১৪২০